

ধর্ম ও প্রকৃতির সহাবস্থান: মহাভারতের পরিবেশদর্শনের পুনর্মূল্যায়ন
গণেশ লেট

Link : https://santiniketansahityapath.org.in/wp-content/uploads/2026/01/23_Ganesh-Let.pdf

Abstract: In Indian scriptures, nature is not perceived merely as an external element of human life but as a living, divine entity. The Mahabharata provides a profound philosophical understanding of this concept. This research paper analyzes the environmental conservation ideas and regulations described in the Mahabharata. The first section discusses the ecological perspective of the Mahabharata, emphasizing the inseparable connection between humans and nature. The second section examines specific environmental directives, including tree planting, water conservation, prevention of animal slaughter, and respect for the earth, all of which are framed within moral and religious principles. The third section explores the contemporary relevance of these teachings, demonstrating how the Mahabharata's ethical framework aligns with modern environmental movements and sustainable development initiatives. The study concludes that in ancient Indian thought, environmental protection was not merely a regulatory or administrative duty but a spiritual and ethical obligation. By revisiting the teachings of the Mahabharata, modern society can establish a strong moral foundation for environmental awareness and sustainable living.

Keywords: Mahabharata, Environmental Conservation, Dharma, Ethics, Sustainable Development.

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় সহাবস্থানের এক অনন্য উদাহরণ। ভারতীয় ধর্মদর্শনের মূল ভিত্তি যে ‘ঋত’ বা সার্বজনীন শৃঙ্খলা, তার সঙ্গে পরিবেশের ভারসাম্য অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। বেদ থেকে উপনিষদ, মহাকাব্য থেকে স্মৃতিশাস্ত্র — সর্বত্রই প্রকৃতিকে দেবতাতুল্য মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। অথর্ববেদে বলা হয়েছে — “মাতা ভূমি: পুত্রোহং পৃথিব্যা:।”^১ ভূমি আমার মাতা, আমি তার সন্তান। এই মন্ত্রটি ভারতীয় চিন্তায় মানব ও প্রকৃতির অখণ্ড সম্পর্কের প্রতীক হয়ে আছে — যেখানে মানুষকে প্রকৃতির অংশ হিসেবে দেখা হয়, ভোক্তা বা শাসক হিসেবে নয়।

মহাভারত, যা শুধু যুদ্ধ, ধর্ম ও রাজনীতির আখ্যান নয়, বরং মানবজীবনের পূর্ণতর দার্শনিক উপাখ্যান — সেখানে প্রকৃতি ও ধর্ম একে অপরের পরিপূরক। ঋষি বেদব্যাস তাঁর এই মহাকাব্যে মানুষ ও পরিবেশের সম্পর্ককে ধর্মের পরিসরে নিয়ে এসেছেন। “য: পৃথিবীং রক্ষতি, স রক্ষিতো ভবতি।”^২ যে পৃথিবীকে রক্ষা করে, পৃথিবীও তাকে রক্ষা করে — এই বাণী শান্তিপর্বে ভীষ্মের উপদেশে পাওয়া যায়, যা পরিবেশ-নৈতিকতার এক গভীর ব্যাখ্যা। এখানে প্রকৃতিকে জড় বস্তু নয়, বরং এক জীবন্ত চেতনাসম্পন্ন সত্তা হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে।

মহাভারতের বিভিন্ন অধ্যায়ে দেখা যায় — বৃক্ষরোপণ, জলাশয় নির্মাণ, প্রাণিসংরক্ষণ প্রভৃতি কর্মকে ধর্মকর্ম ও পুণ্যসাধন হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। যেমন, “য: বৃক্ষান্ রোপয়েত্ লোকে, স তু পুত্রসম: স্মৃত:।”^৩ যে বৃক্ষ রোপণ করে, সে পুত্রপ্রতিম। অন্যত্র ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দেন — “কূপং খননং তদাণাং চ, দানানাং শ্রেষ্ঠমিচ্ছতে।”^৪ যে কূপ ও পুকুর নির্মাণ করে, সে সর্বোৎকৃষ্ট দানের অধিকারী। আরো বলা হয়েছে — “ন হি স্যাত্ সর্বভূতানি, বনানি ন দহেত্ ক্চিৎ।”^৫

কোনো জীবহত্যা করো না, অরণ্য কখনো দহন করো না। এই নির্দেশনাগুলি আজকের Ecocentric Ethics এরই প্রাচীন ভিত্তি। বর্তমান যুগে যখন মানবসভ্যতা জলবায়ুর পরিবর্তন, বনচ্ছেদন ও দূষণের চরম সংকটে, তখন মহাভারতের এই পরিবেশ-ধর্ম আধুনিক মানবতার কাছে এক আলোকবর্তিকা হতে পারে। এই গবেষণাপত্রে সেই প্রাচীন শাস্ত্রীয় ও নৈতিক ভাবনাগুলিকে পুনর্মূল্যায়ন করা হবে — যাতে স্পষ্ট হয় যে ভারতীয় মহাকাব্য কেবল পৌরাণিক বা নৈতিক নয়, বরং এক গভীর পরিবেশদর্শনের শাস্ত্র।

মহাভারতের প্রেক্ষাপটে প্রকৃতিদর্শন:

প্রকৃতিদর্শন (Philosophy of Nature) ভারতীয় সংস্কৃতির এক মৌল উপাদান। প্রাচীন ভারতের মানুষ প্রকৃতিকে কখনো কেবল বস্তুগত সম্পদ হিসেবে দেখেনি বরং তা ছিল তাদের নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। মহাভারত সেই চেতনার এক দার্শনিক দলিল, যেখানে প্রকৃতি কেবল জীবনের পটভূমি নয়, জীবনের কেন্দ্রবিন্দু।

ঋষি বেদব্যাস মহাভারতের বিভিন্ন পর্বে প্রকৃতির সঙ্গে মানবজীবনের সহাবস্থানকে ধর্মের পরিসরে এনেছেন। এই ধারণার বীজ নিহিত আছে বেদে — “যত্নে মধ্যং পৃথিবী যত্নং নম্ভং যাস্ত উর্জস্তন্বঃ সংবভূবুঃ। তাস্তু নো ধৈর্যমি নঃ পবস্ব মাতা ভূমিঃ পুত্রো অহং পৃথিব্যাঃ পূর্জন্যঃ পিতা স ত নঃ পিপর্তু।”^৬ ভূমি আমার মাতা, আমি তার সন্তান। এই বেদমন্ত্র ভারতীয় চিন্তায় মানুষ ও প্রকৃতির চিরন্তন ঐক্যের প্রতীক। মানুষ প্রকৃতির সন্তান; তাই প্রকৃতির রক্ষা মানেই আত্মরক্ষা।

মহাভারতে ধর্ম মানে কেবল সামাজিক কর্তব্য নয়, বরং মহাজাগতিক শৃঙ্খলার রক্ষা। এই শৃঙ্খলা বা ঋত — প্রকৃতির ভারসাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ভীষ্ম শান্তিপর্বে যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিচ্ছেন —

“ধর্ম এব হতো হন্তি ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।

তস্মাদ্ধর্মো ন হন্তব্যো মা নো ধর্মো হতোঽবধীতু।”^৭

ধর্ম রক্ষা করলে ধর্মই রক্ষা করে। এই বাণী কেবল নীতিবাক্য নয়, এটি পরিবেশ নৈতিকতারও মূল সূত্র। ধর্মরক্ষার অর্থ এখানে প্রকৃতি-রক্ষাও বটে। অন্যত্র অনুশাসনপর্বে বলা হয়েছে —

“অহিংসা পরমো ধর্মস্তথাহিংসা পরং তপঃ

অহিংসা পরমং সত্যং যতো ধর্মঃ প্রবর্ততে।”^৮

অহিংসাই পরম ধর্ম। এই অহিংসা কেবল মানুষের প্রতি নয়, সমগ্র জীবের প্রতি অনুশাসিত। অতএব, প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা মহাভারতের ধর্মদর্শনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

মহাভারতে প্রকৃতির প্রতিটি উপাদান — নদী, পর্বত, বৃক্ষ, পশু, বায়ু ও সূর্য — দেবতাতুল্য মর্যাদায় পূজিত। গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী নদীগণ দেবী রূপে; অশ্বখ, বট, নিম্ব বৃক্ষ দেবতার আবাস অরণ্যপর্বে বনাঞ্চলকে তপস্যার স্থান ও দেবতাস্বরূপ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।^৯ এই দেবীকরণ প্রকৃতিকে জড় বস্তু থেকে পবিত্র সত্তায় উন্নীত করেছে, যার ফলে তা লালন ও সংরক্ষণের বিষয় হয়ে উঠেছে, শোষণের নয়। মহাভারত বারবার ঘোষণা করেছে — মানবজীবন সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির অনুগ্রহে নির্ভরশীল। খাদ্য, বায়ু, জল, আলো, উষ্ণতা — সবই প্রকৃতির দান। যদি মানুষ এই দানকে ধ্বংস বা দূষিত করে, প্রকৃতিও তার প্রতিক্রিয়া জানায়। শান্তিপর্বে বলা হয়েছে —

“যদা রাজা ন যথোক্তং চরতি ধর্ম সনাতনম্।

তদা প্রজা নষ্টধর্ম নষ্টলোকাঃ প্রধাবন্তি।।”^{১০}

যখন রাজা ধর্মবিচ্যুত হয়, তখন প্রজাও ধর্মচ্যুত হয়, প্রকৃতিও তার শাস্তি দেয় অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ ও ব্যাধির মাধ্যমে। এই ধারণা আধুনিক eco-spiritualityর সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। নৈতিক অবক্ষয় ও পরিবেশ-বিপর্যয় এখানে একে অপরের ফলাফল।

অরণ্যপর্ব প্রকৃতিদর্শনের এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। বন এখানে কেবল ভৌগোলিক স্থান নয়, বরং-

আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্র। পাণ্ডবদের বনবাসে আমরা দেখি তারা প্রকৃতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিতে বসবাস করছে — তারা বৃক্ষ ও পশুপাখির সহাবস্থানে জীবনযাপন করেছে, জলাশয় সংরক্ষণ করেছে, অকারণে কোনো প্রাণীকে হত্যা করেনি।^{১১} এই অরণ্যজীবন প্রকৃতিকে “সহবাসের স্থান” হিসেবে রূপায়িত করেছে, তা আধুনিক পরিবেশ চিন্তায় “Harmony with Nature” নামে পরিচিত।

মহাভারতের প্রকৃতিদর্শন মূলত অদ্বৈত ভাবনায় প্রতিষ্ঠিত। মানুষ ও প্রকৃতি পৃথক নয়, উভয়ই পরম সত্তার প্রকাশ। এই ঐক্যবোধ থেকেই উদ্ভূত হয়েছে ভারতীয় পরিবেশচেতনা। প্রকৃতি এখানে ভোগের বস্তু নয়, বরং ভক্তির বিষয়। সুতরাং, মহাভারত কেবল নীতি ও পৌরাণিকতার মহাকাব্য নয়, বরং এক গভীর পরিবেশ দর্শনের শাস্ত্র — যেখানে ধর্ম, প্রকৃতি ও মানবজীবন পরস্পরের পরিপূরক।

ধর্ম ও প্রকৃতির পারস্পরিক সম্পর্ক : মহাভারতের প্রেক্ষিত

ভারতীয় চিন্তায় ‘ধর্ম’ শব্দটি কেবল সামাজিক আচরণের নিয়ম নয়, এটি এক মহাজাগতিক ভারসাম্যের প্রতীক। মহাভারতের ধর্মচিন্তা মূলত এই ধারণার ওপর দাঁড়ানো — যেখানে প্রকৃতির রক্ষা মানেই ধর্মের পালন, এবং প্রকৃতির ধ্বংস মানেই ধর্মচ্যুতি। যুধিষ্ঠির শাস্তিপর্বে ভীষ্মকে প্রশ্ন করেন — ধর্মের মূল কোথায়? ভীষ্ম উত্তর দেন

“ধারণাদ্ধর্মমিত্যাহুর্ধর্মো ধারয়তে প্রজাঃ।

যঃ স্যাৎ ধারণসংযুক্তঃ স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ॥”^{১২}

যা ধারণ করে, যা স্থিতি রক্ষা করে, তাই ধর্ম। এই “ধারণ” মানে প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা। অতএব ধর্মের মূল উদ্দেশ্যই হলো পরিবেশ ও জীবজগতের সংরক্ষণ।

মহাভারতের একাধিক স্থানে — সমাজে ধর্মচ্যুতি ঘটে, তখন প্রকৃতি প্রতিক্রিয়া জানায় — অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ও যুদ্ধের মাধ্যমে। অর্থাৎ নৈতিক অবক্ষয় ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় একে অপরের পরিণাম,

“দ্বা ধর্মো হ্যধর্মণ সন্ত্যজ্যতে নরাধিপ।

তদা প্রজা বিনশ্যন্তি বর্ষ নোপযাতি হি॥”^{১৩}

যখন রাজা ধর্ম ত্যাগ করে অধর্মে প্রবৃত্ত হয়, তখন প্রজারা নষ্ট হয়, বৃষ্টি বন্ধ হয়। এই স্লোক পরিবেশচেতনার এক গভীর প্রতীক। রাজনৈতিক ন্যায়নীতি ও প্রাকৃতিক স্থিতির মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশ করা হয়েছে এখানে।

রাজা বা রাষ্ট্রপ্রধানের ধর্মও প্রকৃতির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। রাজা যদি লোভ, অন্যায় বা ক্রোধে পরিচালিত হয়, তাহলে প্রকৃতির শৃঙ্খল ভেঙে যায় — ফলস্বরূপ অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী দেখা দেয়। শাস্তিপর্বে এই সম্পর্কটি সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে—

“রাজা ধর্মো স্থিতো লোকান্ ধারয়ত্যেব ভূমিপ।

অধর্মণ পতত্যেব যথা বৃক্ষো হ্যুপানতঃ॥”^{১৪}

যেমন গাছের মূল কেটে ফেললে গাছ পড়ে যায়, তেমনি রাজা ধর্মচ্যুত হলে পৃথিবী কেঁপে ওঠে। অতএব ধর্ম ও প্রকৃতি একে অপরের নির্ভরশীল শক্তি।

অরণ্যপর্বে তপস্যা ও প্রকৃতির সম্পর্কও গভীরভাবে প্রকাশিত। তপস্যা মানে আত্মনিয়ন্ত্রণ, ইন্দ্রিয়সংযম ও প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যে জীবনযাপন। তপস্যার মাধ্যমে মানুষ প্রকৃতির শক্তির সঙ্গে ঐক্য অনুভব করে,

“তপো হি পরমং শক্তিং প্রজাঃ সর্বাঃ সমাপ্রিতাঃ।

তপসা ধার্যতি লোকঃ তপসা পর্জন্যবৃষ্টয়ঃ॥”^{১৫}

তপস্যা সর্বোচ্চ শক্তি, এর দ্বারাই পৃথিবী টিকে থাকে, বৃষ্টি হয়, জীবন চলে। অতএব ধর্ম, তপস্যা ও প্রকৃতি একই মহাজাগতিক সূত্রে গাঁথা। আজকের পরিবেশ সংকট — যেমন জলবায়ু পরিবর্তন, বননিধন, দূষণ — এই ধর্মচ্যুতিরই আধুনিক রূপ। মহাভারতের শিক্ষা আজও প্রাসঙ্গিক, যদি আমরা প্রকৃতিকে অবমাননা করি, ধর্মও আমাদের ত্যাগ করবে। অতএব প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থানই মানবধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ।

পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কিত বিধানসমূহ : মহাভারতের প্রেক্ষাপটে

মহাভারতে প্রকৃতি-রক্ষা কেবল সামাজিক নয়, ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবে প্রতিপন্ন। ‘ভূমি’, ‘অপ’, ‘অগ্নি’, ‘বায়ু’, ‘আকাশ’ — এই পঞ্চমহাভূতের প্রতি শ্রদ্ধা মানবজীবনের অপরিহার্য অংশ। শান্তিপর্বে ভীষ্ম বলেন —

“ভূমি ন হিঁস্যাৎ সর্বথা সর্বভূতহিতৈ রতঃ।

ভূমিঃ সর্বস্য ভূতস্য মাতা গর্ভধরী স্মৃতা॥”^{১৬}

যিনি সকল জীবের মঞ্জালে নিয়োজিত, তিনি কখনো পৃথিবীকে আঘাত করবেন না, কারণ পৃথিবী সকল জীবের মাতা। এই শ্লোক থেকে স্পষ্ট, ভূমিকে রক্ষা করা মানে মাতৃরক্ষা, অতএব পরিবেশ-সংরক্ষণই মানবধর্ম।

মহাভারতের অরণ্যপর্বে বনকে তপস্যার স্থান, আশ্রমের আশ্রয়স্থল ও দেবতাস্বরূপ বলা হয়েছে। বৃক্ষকে কাটা বা ধ্বংস করা সেখানে পাপ হিসেবে গণ্য,

“যো বৃক্ষং চিনতি মূর্খঃ স্বার্থে কামবহানুগঃ।
তস্য পুণ্যং বিনশ্যতি পাপং চোপরিবর্ধতি॥”^{১৭}

যে ব্যক্তি স্বার্থপরভাবে বৃক্ষ কেটে ফেলে, তার সমস্ত পুণ্য নষ্ট হয়, পাপ বৃদ্ধি পায়। অন্যত্র বলা হয়েছে,

“একং বৃক্ষং যঃ প্রতিরোপয়তি
স যন্নসহস্রফলমাপ্নোতি॥”^{১৮}

যে একটি বৃক্ষ রোপণ করে, সে হাজার যজ্ঞের সমান ফল লাভ করে। অতএব বৃক্ষরোপণ মহাভারতে ধর্মীয় যজ্ঞের সমতুল্য বলে গণ্য হয়েছে।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে জল (আপঃ) দেবত্বের প্রতীক। গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী প্রভৃতি নদী দেবী রূপে পূজিতা। অতএব নদী বা জলাশয় দূষণ বা নষ্ট করা পাপ বলে বিবেচিত। অরণ্যপর্বে বলা হয়েছে,

“আপো দেবতাঃ পূজ্যাঃ সর্বভূতহিতৈ রতঃ।
যো আপঃ মলিনীকুর্যাত্ স পতন্ত্যেব ন সংশয়ঃ॥”^{১৯}

জল দেবতা, সকল জীবের মঞ্জালের কারণ। যে ব্যক্তি জলকে অপবিত্র করে, সে নিঃসন্দেহে পতিত হয়। এই নীতিই আধুনিক পরিবেশ বিজ্ঞানে “Water ethics”এর আদি সংস্করণ বলে বিবেচিত হতে পারে। ‘বায়ু’ ও ‘অগ্নি’ — এ দুটি উপাদান মহাভারতের মতে জীবনরক্ষার শক্তি। অগ্নির অপব্যবহার বা বায়ুর দূষণ মানুষের নৈতিক অবক্ষয়ের প্রতীক হিসেবে দেখা হয়েছে।

“বায়ুর্জগৎ ধারয়তি, তেন সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
তস্মাদ্ বায়োঃ পূজনং নীত্য কার্যং হিতৈষিণা॥”^{২০}

বায়ু জগৎকে ধারণ করে, তাই হিতৈষী মানুষকে নিতাই বায়ুর পূজা করা উচিত। এখানে “বায়ুর পূজা” মানে প্রকৃত অর্থে “পরিবেশের প্রতি শ্রদ্ধা ও সংরক্ষণবোধ”।

মহাভারতের পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কিত বিধানসমূহ প্রমাণ করে যে, প্রকৃতি কেবল জীবনের পটভূমি নয় — এটি ধর্ম, নৈতিকতা ও জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ভূমি, বন, জল, বায়ু, প্রাণী প্রতিটি উপাদানের রক্ষা মানেই ধর্মরক্ষা। এই চেতনা আধুনিক পরিবেশনীতি (environmental ethics)এর মূল অনুপ্রেরণা হিসেবেও বিবেচিত হতে পারে।

ধর্ম ও প্রকৃতির সহাবস্থান — মহাভারতের পরিবেশদর্শনের সারসংক্ষেপ

ভারতীয় চিন্তায় ধর্ম ও প্রকৃতি কখনো একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। ধর্ম মানে শুধু সামাজিক নীতিনির্দেশ নয়, বরং মহাজাগতিক সাম্যের (Cosmic Harmony) রক্ষা। মহাভারতে এই ধারণাটি সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে — যেখানে ধর্ম মানে ‘প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থান।’ ঋষি বেদব্যাস তাঁর এই মহাকাব্যে মানুষকে ভূমির রক্ষক, বন ও প্রাণীর সহচর এবং প্রকৃতির সেবক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, “যঃ পৃথিবীং রক্ষতি স রক্ষিতো ভবতি।”^{২১} যে পৃথিবীকে রক্ষা করে, পৃথিবীও তাকে রক্ষা করে। এই শ্লোকটি কেবল ধর্মীয় উপদেশ নয়, এটি মানবসভ্যতার স্থায়িত্বের চিরন্তন সূত্র।

মহাভারতের অরণ্যপর্বে পাণ্ডবদের বনবাস কেবল এক রাজনৈতিক নির্বাসন নয়, বরং প্রকৃতির সঙ্গে নৈতিক মিলনের পর্ব। তারা অরণ্যে বাস করেছে বিনয়ের সঙ্গে, প্রাণী ও বৃক্ষকে ক্ষতি না করে,
 “ন হিঁস্যাৎ সর্বভূতানি
 ধর্ম ইত্যেব ন: শ্রুতি:।”^{২২}
 সকল জীবকে আঘাত করো না — এটাই ধর্ম বলে শ্রুতি নির্দেশ দেয়। অতএব মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক অহিংসা ও সহর্মিতার ভিত্তিতে গঠিত।

মহাভারতের একাধিক পর্বে প্রকৃতিকে ঈশ্বরীয় শক্তির প্রতিফলন হিসেবে দেখা হয়েছে। বিশ্বের প্রতিটি উপাদানই ঈশ্বরের প্রকাশ। “ইথাবাস্যমিদং সর্বং যক্তিঞ্চ জগত্যাং জগত্।”^{২৩} এই জগতে যা কিছু বিদ্যমান, সবই ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছন্ন। এই বেদীয় দৃষ্টিভঙ্গি মহাভারতে বিকশিত হয়ে প্রকৃতি-ভক্তি ও পরিবেশচেতনার রূপ নেয়। অতএব প্রকৃতিকে ধ্বংস করা মানে ঈশ্বরীয় সত্তাকে অবমাননা করা।

মহাভারতে রাজা বা শাসকের অন্যতম কর্তব্য হলো প্রজার সঙ্গে সঙ্গে ভূমি, বন ও নদীর রক্ষা করা। ভীষ্ম বলেন,

“ভূমি: সংবর্ধনং নিত্যং রাজা ধর্মেণ পালয়েত্।
 ভূমৌ নিহিতং সর্বং তস্মাদ্ ভূমিঁ ন হিঁসয়েত্॥”^{২৪}

রাজা সর্বদা ধর্মানুসারে ভূমিকে রক্ষা ও উন্নত করবেন; কারণ ভূমিতেই সমস্ত কিছু নিহিত। এখানে রাষ্ট্রনৈতিক ধর্ম (Rajadharma) পরিবেশনৈতিকতার (Environmental Ethics) সঙ্গে সমন্বিত। অতএব পরিবেশরক্ষা কেবল ব্যক্তিগত কর্তব্য নয়, শাসননীতিরও অবিচ্ছেদ্য অংশ।

মহাভারতের মতে, ধর্ম ও প্রকৃতি উভয়ই ‘ঋত’ বা মহাজাগতিক শৃঙ্খলার অংশ। মানুষ সেই শৃঙ্খলার ভেতরেই বেঁচে থাকে। এই শৃঙ্খলা ভঙ্গা হলেই ভারসাম্য নষ্ট হয়, ফলে দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ, বন্যা, ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়,

“যদা যদা হ্যধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
 অমৃত্যানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥”^{২৫}

যখন ধর্মের অবনতি ঘটে, তখন আমি নিজে থেকে প্রকাশ করি। এখানে ‘অধর্ম’ কেবল সামাজিক নয়, প্রকৃতির অবমাননাও ধর্মবিরুদ্ধ আচরণ। অতএব ধর্ম ও প্রকৃতির এই সহাবস্থানই মহাভারতের পরিবেশ দর্শনের মূল মন্ত্র। মহাভারতের পরিবেশদর্শন মূলত এক সমন্বিত নৈতিক দর্শন, যেখানে ধর্ম, সমাজ ও প্রকৃতি — এই তিনের মধ্যে এক অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে। প্রকৃতি এখানে শাসিত নয়, সম্মানিত, ধর্ম এখানে ভোগ নয়, ভারসাম্য, আর মানুষ এখানে মালিক নয়, সংরক্ষক। এই দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক যুগে যখন পরিবেশ-সংকট চরমে, তখন এক প্রাচীন আধ্যাত্মিক দিশা হিসেবে পুনর্মূল্যায়নযোগ্য।

উপসংহার

মহাভারত কেবল একটি মহাকাব্য নয়, এটি ভারতীয় সভ্যতার সাংস্কৃতিক চেতনার মহাগ্রন্থ, যেখানে ধর্ম, নীতি, সমাজ ও প্রকৃতি এক অবিচ্ছেদ্য সত্তায় মিলিত। মহাভারতের পরিবেশদর্শন এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে যে মানুষ ও প্রকৃতি কখনোই পরস্পর-বিচ্ছিন্ন নয়; উভয়ের অস্তিত্ব পারস্পরিক নির্ভরতার ভিত্তিতে টিকে থাকে। প্রকৃতি এখানে ভোগের উপকরণ নয়, বরং জীবনের সহচর ও আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্র। ঋষি বেদব্যাস এই গ্রন্থে এক গভীর পরিবেশ-নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন — যেখানে প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা মানে ধর্ম পালন, এবং প্রকৃতির অবমাননা মানে ধর্মভ্রষ্টতা।

অরণ্যপর্বের তপস্যামূলক জীবনধারা, কর্ণপর্বে নৈতিকতার সঙ্গে প্রাকৃতিক প্রতিক্রিয়ার যোগসূত্র, শান্তিপর্বের ধর্মচিন্তা — এই সমস্ত স্তর মিলিয়ে মহাভারত একটি সমন্বিত পরিবেশ দর্শনের দার্শনিক রূপরেখা নির্মাণ করেছে। এ দর্শনে প্রকৃতি দেবত্বের প্রতীক, সহাবস্থানের ক্ষেত্র, এবং নৈতিক দায়িত্বের মাপকাঠি।

এই ভাবনাই আধুনিক পরিবেশ আন্দোলনের মূল চেতনার সঙ্গে গভীরভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সমসাময়িক “Eco-Spirituality” বা “Environmental Ethics” এর যে ধারণা, তার আদি রূপ পাওয়া যায় মহাভারতের অন্তর্লীন দর্শনে। প্রকৃতি সংরক্ষণ এখানে কেবল প্রশাসনিক নীতি নয়, এটি ধর্মীয় অনুশাসন ও আত্মিক সাধনার পথ। অতএব বলা যায়, মহাভারতের পরিবেশচেতনা কেবল প্রাচীন ঐতিহ্য নয়, এটি আধুনিক পরিবেশ-সংকট মোকাবিলার এক চিরন্তন দার্শনিক দিশা। মানবসভ্যতার টিকে থাকার জন্য আজও প্রয়োজন সেই চেতনা, যেখানে “ধর্ম” ও “প্রকৃতি” একে অপরের সহাবস্থানে বিকশিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জি

মূল গ্রন্থাবলী:

1. বেদব্যাস, ‘মহাভারত’, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ, ২০১৮
2. ‘The Mahabharata’, Translated by Kisari Mohan Ganguli, Delhi, Motilal Banarsidass, 1970 (Reprint)
3. ‘Puranas’ (Vishnu Purana, Matsya Purana, Padma Purana), Various editions, Delhi, Chowkhamba Sanskrit Series.
4. ‘Rigveda Samhita’, Trans, Ralph T.H. Griffith, Delhi, Munshiram Manoharlal Publishers, 1995
5. ‘Bhagavad Gītā’, Trans, Swami Gambhirananda, Kolkata, Advaita Ashrama, 2013

সহায়ক ও সমালোচনামূলক গ্রন্থাবলী:

6. চক্রবর্তী বিশ্বনাথ, ‘ভারতীয় দর্শন ও পরিবেশচেতনা’, কলকাতা, দে’জ পাবলিকেশন, ২০১৯
7. ভট্টাচার্য অনিলকুমার, ‘ধর্ম ও প্রকৃতি: মহাভারতের দার্শনিক ব্যাখ্যা’, শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী প্রকাশনী, ২০২১
8. Sharma Arvind, ‘Hinduism and Ecology: The Intersection of Earth’, Sky, and Water. Delhi, Oxford University Press, 2000
9. Dwivedi, O.P. and B.N. Tiwari, Environmental Crisis and Hindu Religion, New Delhi, Gian Publishing House, 1987
10. Kinsley David, ‘Ecology and Religion: Ecological Perspectives in Hindu Thought’, Delhi, Motilal Banarsidass, 1995
11. Singh Radhika, ‘Dharma and Ecology in the Mahabharata’, New Delhi, Indica Books, 2012
12. Chaturvedi, ‘B.K. Environment and Vedic Wisdom’, New Delhi, Rupa & Co., 2004
13. Banerjee, S. ‘Ancient Indian Concepts of Nature and Ecology’, Kolkata, Sanskrit Pustak Bhandar, 2018

গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও নিবন্ধ

14. Sharma V.P. ‘Ecological Ethics in the Mahabharata: A Re-evaluation’, Journal of Indian Philosophy and Religion, Vol. 22, No. 3, 2019, pp. 41–58
15. Mukherjee S. ‘The Concept of Nature in Hindu Epics: An Ethical Review’, Indian Journal of Cultural Studies, Vol. 15, 2020, pp. 77–90
16. Bhattacharya M. ‘Environmental Awareness in Ancient Indian Texts’, Sanskrit and Society, Vol. 8, Issue 2, 2017, pp. 35–49
17. Ghosh, R. ‘Dharmic Ecology: Reassessing the Mahabharata’s Environmental Philosophy’, Asian Humanities Review, Vol. 12, 2021, pp. 101–119

Online & Contemporary References:

18. 'Environmental Thought in Hindu Texts', The Oxford Centre for Hindu Studies, Retrieved from: <https://ochs.org.uk/hinduism-and-ecology>
19. 'Mahabharata and the Ecological Vision of India', Research Gate Article, accessed 2023
20. 'Vedic Ecology and Modern Sustainability', Indian Cultural Forum, accessed 2024

About the author: Ganesh Let, Assistant professor, Department of Sanskrit, Rampurhat College, West-Bengal.